DEC. 28 2001 DEC. 2? 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির নামে লেজুড়বৃত্তি চলতে দেয়া যায় না

ড. শামসুল আলম মোহন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত সংসদ অধিবেশনে বলেছেন, তিনি প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি আইন করে বন্ধ করে দেবেন। শিক্ষাঙ্গনসমূহে ছাত্র রাজনীতির নামে যে বীভৎস সন্ত্রাসী হানাহানি, জবরদখল, চাঁদাবাজি চলছে তা অবশ্যই ভয়াবহ শংকার কারণ এবং আমাদের সমুদয় শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই স্থবির, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন করে তুলেছে। এই সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কঠোর উচ্চারণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হলেও কতটা আন্তরিকতাপূর্ণ ও যথাযথ সে প্রশ্ন বিবেচনা করা যায়। বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ রাষ্ট্রপতি থাকাকালে রাজনীতিবিদদের প্রতি পরামর্শ রেখেছিলেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সে সময়ে নাগরিক সমাজের কোন কোন অংশের সমর্থন তিনি পেলেও, রাজনীতি সংশ্লিষ্ট সমাজের বিভিন্ন অংশ থেকে বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী রাজনীতি বন্ধে সম্মত হলে তিনিও তাই করবেন।

এদেশে ছাত্র রাজনীতির অতীত ভূমিকাকে, বিশেষ করে আমাদের রাষ্ট্রীয় সত্তার উত্তরণে ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতাকে প্রায় সবাই শ্রদ্ধার সংগে স্বীকার করেন। যদিও স্বৈরাচারী সেনা শাসকবৃন্দ ছাত্র সমাজকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাদের কোন কোন অংশকে সুপরিকল্পিতভাবে অস্ত্র ও অর্থ যুগিয়েছে এবং সে কলংকের ইতিহাসও প্রায় সকলেরই জানা।

আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সংকটকালে, সমাজের অগ্রসর শ্রেণী হিসেবে ছাত্রদের গৌরবজনক সব ভূমিকা সত্ত্বেও, বিশেষভাবে নব্বই দশকের শুরুতে শিক্ষাঙ্গনগুলোতে ছাত্রনামধারী, ছাত্র-অছাত্র নেতাদের দৌরাত্ম্য, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, নারীঘটিত হস্তক্ষেপ ও অন্তর্দলীয় হানাহানি অভাবনীয় মাত্রা পেয়ে যায়। সে সময়কালে প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিরোধীমতের ছাত্রনেতা ও সমর্থকবৃন্দ বিতাড়িত হয়। এমনকি বিরোধীমতের পত্র-পত্রিকাও ছাত্রাবাসগুলোতে প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ছাত্রাবাসে এবং চত্বরে মিছিলে-শোভাযাত্রায় চলে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া। নিজেদের দলীয় অন্তঃকোন্দলে প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রের ব্যবহারে চত্বরগুলোতে ছাত্র নিহত হতে থাকে। নব্বই দশকের প্রথমার্ধে, ছাত্র সংঘর্ষে এক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হয়েছিল ১৫ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ ডজনের উপর এবং এমনতরো সব বিশ্ববিদ্যালয়েই। মাসের পর মাস এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থেকেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তেমনি হতাশাজনক পরিস্থিতিতে সে সময়ে ভারতে বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রায় ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণে গমন করে এবং ভারতে আমাদের সম্পদ প্রবাহের অন্যতম খাত হয়ে দাঁড়ায় এই পরমুখী শিক্ষা। শিক্ষকগণও হতে থাকেন রাজনৈতিকভাবে পুরস্কৃত। কট্টর সরকারী দল সমর্থকদের মধ্য থেকেই সকল ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োজিত হয়েছেন। কেউ গেছেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে, রাষ্ট্রদূতের চাকুরিতে। আর এসব পদ-পদবী পেতে অনেক 'স্বনামধন্য' শিক্ষক ছাত্র নেতৃবৃন্দের দ্বারস্থ হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ-পদবী এমনকি প্রমোশন নিতে গিয়ে অনেক শিক্ষক, ছাত্রনেতৃবৃন্দের সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টির সুযোগ নিয়েছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ হয়ে উঠল প্রচন্ড ক্ষমতাধর। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, কোন ছাত্র নেতৃবৃন্দকে পরীক্ষায় ফেল করানো যাবে না। নতুন শিক্ষক নিয়োগ ছাত্র নেতৃবৃন্দের সুপারিশ ছাড়া হতে পারবে না। সব- কিছুই প্রকাশ্যে হচ্ছিল, ভিন্ন মতের কারো কিছু বলবার শক্তিও কার্যতঃ অস্ত্রধারীদের দাপটে রহিত হয়ে গিয়েছিল।

মধ্য-নব্বইয়ের নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হল। চত্বরে মুখ বদল হল। অবস্থার তেমন পরিবর্তন হল না, যদিও আত্মঘাতী প্রকাশ্য খুনোখুনির সংখ্যাটা কমে এল। তবে সেই চাঁদাবাজি, সশস্ত্র মাস্তানি, শিক্ষক নিয়োগে হস্তক্ষেপ, কর্মচারী নিয়োগে টাকা গ্রহণ, টেন্ডারবাজি চলতেই থাকলো। সবই চলতে থাকলো একদলীয়ভাবে। চত্বরে অন্য মতাবলম্বী, বিশেষভাবে ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের ছাত্র সমর্থকদের কোন অস্তিত্ব রাখা হল না। প্রতি রাত্রে ছাত্রাবাসে গোলাগুলীর মহড়া চললেও পুলিশ থেকেছে নির্বিকার। এক কমিউনিষ্ট কিংবা তালেবান শাসন ছাড়া এতটা নির্ভেজাল একদলীয়করণ কল্পনা করা যায় না। ২০০১ সনের অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার রাতেই দেখা গেল, এইসব 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার' সব স্লোগান উধাও। সে স্থান পূর্ণ করলো জাতীয়তাবাদী সৈনিকেরা। আশা করা যায়, আগামী পাঁচ বছর এই চত্বর ছেড়ে যাওয়া অনেক ছাত্রই আর চত্বরে ফিরতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়পর্যায়ে গণতন্ত্রের নামে কি অদ্ভুত দৃশ্য! যেখানে অন্য মতের অবস্থান একেবারে অসহনীয়। শুধু তাই নয়, ভিন্নমত প্রকাশ পায় এমন সংবাদপত্র, বিশেষভাবে 'সংবাদ' ও 'জনকণ্ঠ' সকল ছাত্রাবাসে দেয়া বন্ধ করা হয়েছে। এখন ব্যাপকতর চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, হুমকি প্রদর্শন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহনের যথেচ্ছ ব্যবহার যেন পূর্বের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। ইতোমধ্যে অন্তর্দলীয় কোন্দলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্রনেতা 'হাসু' নিহত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছর এই নিহত ছাত্রনেতা 'হাসু' চত্বরে ছিল না। যারা চাকরিতে নিয়োজিত ছিল এবং বিগত পাঁচ বছরে ছাত্রত্ব চুকিয়েছিল, তেমন ১৫-২০ জন ফিরে এসে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে ভর্তি হবার দরখাস্ত দিয়েছে এবং এরা সকলেই এখন ছাত্র নেতা। সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই এমনসব নতুন ছাত্র নেতার সমাবেশ ঘটেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, চাকরি ছেড়ে কেন আবার তারা ছাত্রনেতা হচ্ছে? ছিয়ানব্বইতেও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। ছাত্র রাজনীতি করছে এমন মোট ছাত্র সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগের বেশী নয়। এরা সকল ছাত্রাবাস দখলে নিয়েছে এবং ইচ্ছেমত সীট বিলি-বন্টন করছে। দখলদারি, অস্ত্রবাজি, টেন্ডারবাজি, নিয়োগে টাকা গ্রহণ, টাকা কিংবা আশ্রয়ের বিনিময়ে কোন কোন শিক্ষককে সুবিধা পাইয়ে দেয়া– এসবই কেবল সম্ভব ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের সশ্রব ও প্রশ্রয়ের ভিত্তিতে। আর ক্ষমতায় যেয়ে আমাদের সরকার সব নিয়োগ, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুযোগ প্রদান-সবকিছুই করেন দলীয়করণের ভিত্তিতে। এই যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভাইস-চ্যান্সেলর বদল, তা সবকটাই দেয়া হয়েছে দলীয় ভিত্তিতে। সেই পেয়েছে নিয়োগ, মূল দলের নেতাদের সঙ্গে যে শিক্ষক সবচেয়ে কার্যকরভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছে। নিয়োগপ্রাপ্তরা, দলীয় শিক্ষকদের মধ্যে প্রবীণ, সর্বোচ্চ

নব্বই দশকের প্রথমার্ধে, ছাত্র সংঘর্ষে এক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিহত হয়েছিল ১৫ জন, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ ডজনের উপর এবং এমনতরো সব বিশ্ববিদ্যালয়েই। মাসের পর মাস এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থেকেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তেমনি হতাশাজনক পরিস্থিতিতে সে সময়ে ভারতে বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রায় ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা গ্রহণে গমন করে এবং ভারতে আমাদের সম্পদ প্রবাহের অন্যতম খাত হয়ে দাঁড়ায় এই পরমুখী শিক্ষা। শিক্ষকগণও হতে থাকেন রাজনৈতিকভাবে পুরস্কৃত। কট্টর সরকারী দল সমর্থকদের মধ্য থেকেই সকল ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োজিত হয়েছেন। কেউ গেছেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে, রাষ্ট্রদূতের চাকুরিতে। আর এসব পদ-পদবী পেতে অনেক 'স্বনামধন্য' শিক্ষক ছাত্র নেতৃবৃন্দের দ্বারস্থ হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ-পদবী এমনকি প্রমোশন নিতে গিয়ে অনেক শিক্ষক, ছাত্রনেতৃবৃন্দের সুপারিশ ও চাপ সৃষ্টির সুযোগ নিয়েছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ হয়ে উঠল প্রচন্ড ক্ষমতাধর। পরিস্থিতি এমনই দাঁড়িয়েছিল যে, কোন ছাত্র নেতৃবৃন্দকে পরীক্ষায় ফেল করানো যাবে না। নতুন শিক্ষক নিয়োগ ছাত্র নেতৃবৃন্দের সুপারিশ ছাড়া হতে পারবে না। সব- কিছুই প্রকাশ্যে হচ্ছিল, ভিন্ন মতের কারো কিছু বলবার শক্তিও কার্যতঃ অস্ত্রধারীদের দাপটে রহিত হয়ে গিয়েছিল।

ডিগ্রিধারী কিংবা গবেষণা ও শিক্ষকতায় শ্রেষ্ঠ এমনটাও হয়নি। সরকারের পক্ষে দলীয়করণটাই শেষ কথা, অন্য কিছু নয়। তা না হলে, সবকটা বিশ্ববিদ্যালয়েই ভাইস-চ্যান্সেলর পদের মেয়াদ শেষ না হতেই তাদের দায়িত্ব পালনকে প্রায় অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল কেন? তা করতে কোন্ ছাত্র নেতৃবৃন্দ ভূমিকা রেখেছিল, দেশবাসীর কি তা অজানা? সেইসব ছাত্র নেতার বেআইনী সব কর্মকান্ডকে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমকে 'ছাত্র রাজনীতি' বলে এখন চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজকে মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্মেষের স্থান নয়। সকল নিয়োগে দলীয়করণে জর্জরিত হয়ে শিক্ষা-গবেষণা আজকে বিপর্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থ অপচয় ও নিয়ম-শৃঙ্খলাহীনতায় প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। শিক্ষকদের প্রতিভা ও অবদানের মূল্যায়ন নেই। বছর গুণেই সকল স্তরে প্রমোশন হচ্ছে। প্রকাশনার নামে চলছে নানা কেলেঙ্কারি। বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষকদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই এখন পূর্ণ প্রফেসর, যা বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর উন্নয়নশীল কোন দেশেও দেখা যাবে না। সরকারী টাকায় চলেও এমন জবাবদিহিহীনতা অন্যত্র দেখা যাবে না। নব্বই দশকের দুই সরকারের আমলেই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কোন কোন নেতা-নেত্রী বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্য হয়ে কিংবা স্থানীয় নেতা বা সাংসদ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি প্রদান ও নামে-বেনামে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণের দৃষ্টান্ত রেখেছে। নেতা বা নেত্রী হিসেবে এরা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা সমাজের স্বার্থ না দেখে শুধু নিজেদের অর্জন বা স্বার্থটাকেই বড় করে দেখেছে। এ কারণে এসব নেতা-নেতৃবৃন্দ তথাকথিত ছাত্র নেতাদের হাতে রাখতে গিয়ে তাদের অন্যায়-অপকর্মের সুযোগ দিয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষেই নিরপেক্ষ ও নিয়ম-শৃঙ্খলার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালনা করা অসম্ভব।

আসলে মূল সমস্যা রাজনৈতিক দলের, যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গির চুইয়ে পড়া প্রভাবে ছাত্র নামধারী নেতারা পরিচালিত হয়ে আসছে এবং সমাজে-চত্বরে বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে। খুব ধীর-স্থিরভাবে দেখলে যে কোন শান্তিপ্রিয়, আইনের প্রতি অনুগত নাগরিকের জন্য এ অবস্থা অবশ্যই অসহনীয় ও বেদনাদায়ক।

এসবকে ছাত্র রাজনীতি হিসেবে বলা হচ্ছে। সমুদয় ছাত্র সমাজের বৃহত্তম অংশ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। রাজনৈতিক দলের সৃষ্ট নিজেদের অপকর্ম ও দখলদারিত্ব বন্ধ না করে, সংকীর্ণ দলীয়করণের অবসান না ঘটিয়ে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ঘোষণা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক ও ভিন্ন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই ঘোষণা নেতা-নেত্রীদের বাস্তব অবস্থা উপলব্ধির পরিচয় বহন করে না। বরং 'ছাত্ররাজনীতি' বন্ধ করা, 'হরতাল' করাকে বেআইনী ঘোষণার বক্তব্য বলা যায় অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ক্ষমতাকে আরো সংহতকরণ ও স্থায়ীকরণের সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য নিয়েই এসব ঘোষণা দেয়া হচ্ছে বলে অনুমান করা যায়, যা সৃষ্ট নৈরাজ্যকর অবস্থার সমাধানের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

ভোটার হবার বয়স ১৮ বছর। আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে যে কোন নাগরিকের রাজনীতি আলোচনা ও বক্তব্য প্রদানের অধিকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ স্বীকৃত বিষয়। এটা আইন করে বন্ধ করে দেবার হুমকি সম্পূর্ণ বেআইনী ও গণতন্ত্রবিরোধী। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গনে যেটা অপরিহার্য, তা হল নগ্ন দলীয়করণ অবিলম্বে বন্ধ করা। রাজনৈতিক দলগুলোর কোন ছাত্র ফ্রন্ট না রাখা। বরং রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তিতে ছাত্রদের জড়ানো অনৈতিক ও অন্যায়। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী কর্তৃক ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতা বা কমিটি ঘোষণা দৃষ্টিকটু ও অগ্রহণযোগ্য। অছাত্র দিয়ে ছাত্র সংগঠন পরিচালনা সুস্থ চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির সহায়ক হতে পারে না। এ ধারা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। আজকের সমাজ প্রেক্ষাপটে, যেখানে নাগরিক সমাজের বিস্তৃতি ঘটেছে, পত্র-পত্রিকার সংখ্যা ও পাঠক শ্রেণী যথেষ্ট বেড়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, ব্যাপক জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করছে, রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর শাখা বা কমিটি গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠন রাখা ও তাদের সরাসরি রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত করা এখন অপ্রয়োজনীয়। এতে ক্ষতি ছাড়া কারো কোন লাভ হচ্ছে না। বিগত পাঁচ বছর আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছিল সকল শিক্ষাঙ্গনে একচ্ছত্র। শিক্ষাঙ্গনগুলোর প্রায় সকল বিষয়ই এরা নিয়ন্ত্রণ করেছে। আর সারাদেশে ছাত্রদলের অস্তিত্ব ছিল বলে মনেই হয়নি। দলীয় কোন অনুষ্ঠান করতেও এদের দেখা যায়নি। তাতে কিন্তু বিএনপিকে ক্ষমতায় আসতে কোন বেগ পেতে হয়নি। আর সুবিধাপ্রাপ্ত প্রবল ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের পরাজয় ঠেকাতে পারেনি। এ হল আজকের বাস্তবতা। সরকারী দল হিসেবে বিএনপি নেতৃত্ব যদি ছাত্রদলকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া বন্ধ করে, তাহলে বিএনপির জন্যতো বটেই, দেশের জন্যও তা হবে সুদূরপ্রসারী কল্যাণকর। শিক্ষাঙ্গনগুলোতে বন্ধ হবে খুনোখুনি, আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাটা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে। প্রসঙ্গক্রমে এটাও বলা যায়, বিএনপি সংগঠন হিসেবে এখন যে জনসমর্থনের অধিকারী তাতে দৃঢ়তার সঙ্গেই ছাত্র সংগঠনের লেজুড়বৃত্তিকে পরিহার করতে পারে। মনে রাখতে হবে, বিএনপি এককভাবে নির্বাচন করলেও এ বছর নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হত। বিশ্লেষণে দেখা যায়, গড়ে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় জামায়াতের ভোট রয়েছে প্রায় সাড়ে আট হাজার। বিএনপির সাড়ে আট হাজারের অধিক ভোট পেয়ে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছে ১৭৪ জন, মানে বিজয়ের জন্য জামায়াতের সমর্থন অপরিহার্য ছিল না। এই দৃঢ় জনসমর্থনের কারণেই জনবিরোধী নয়, গণতন্ত্রবিরোধী নয়, বরং সঠিক সিদ্ধান্তটিই বিএনপির দ্রুত গ্রহণ করা উচিত, যা বিএনপি দল ও দেশকে উপকৃত করবে। মূল রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র শাখা না রাখা, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে আইনী শাসন প্রতিষ্ঠাকে সচেতন জনগণ প্রবলভাবে সমর্থন জানাবে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির এই বর্তমান বাস্তবতায় টিকে থাকতে হলে আওয়ামী লীগকেও এ বাস্তবতা গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। রাজনৈতিক পদপদবীধারী নেতা, মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও সাংসদবৃন্দকে,